দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ 17 DEC 2017 পৃষ্ঠা 4 কলাম 2

বিশ্বজিত রায়

সর্বব্যথায় ব্যথিত প্রাথমিক শিক্ষা

শিক্ষাজীবনের প্রথম সিঁড়ি হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। মই বেয়ে ওপরে উঠতে হলে নিচের সর্বশেষ সারিতে পা ফেলে যেমন ঊর্ধ্বভাগের নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছতে হয়, প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থানটাও ঠিক তেমনি। এই শিক্ষাঙ্গনকে মানবজীবনের আঁতুড়ঘরও বলা যেতে পারে। জন্মকালীন এক নিরাপদ আশ্রয়ে মা সদ্যভূমিষ্ঠ সন্তানটিকে যেমন স্তন্যদান করে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকেন, তদ্রূপ প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রটাও শিক্ষাশূন্য একটি মানবশিশুকে সুন্দর শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পরিপক্ব বীজ বপন করে উচ্চশিক্ষার ছাড়পত্র দিয়ে আলোকিত জীবনে পৌঁছার পথ দেখিয়ে দেয়। একটি কোমল মনের দুরন্ত অবুঝ নরম অঙ্গকে সুশিক্ষা সহায়ক অ-আ-ক-খ ও এ-বি-সি-ডি মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে জীবন পরিবর্তনের মজবুত ভিত তৈরির নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা দিয়ে থাকে প্রাথমিক শিক্ষাস্তর। এক কথায় জীবনজয়ের অনুর্বর মাটিতে ফলন ফলানোর চাষা দায়িত্ব পালন করে থাকে এই শিক্ষাঙ্গন। এটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষাকেন্দ্র। শিক্ষার প্রারম্ভকালীন এই সুযোগটা আমাদের শিক্ষা প্রাঙ্গণে কতখানি নিরাপদে পা ফেলতে পারছে তা নিয়ে রয়েছে প্রশ্ন।

মানুষের মৌলিক অধিকারের অন্যতম অনুষঙ্গ শিক্ষা। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা এই পাঁচটি মৌল চাহিদার যে কোনো একটিকে বাদ দিয়ে মানুষ সুন্দর ও স্বাভাবিকভাবে জীবনধারণ করতে পারবে না। মানুষকে বাঁচতে গেলে যেমন খাদ্যের প্রয়োজন, সম্ভ্রম ও লজ্জা ঢাকতে যেমন বস্ত্রের প্রয়োজন, জন্তু-জানোয়ার ও দুর্যোগের কবল থেকে রক্ষা পেতে যেমন বাসস্থানের প্রয়োজন, রোগ-ব্যাধি বেদনামুক্ত জীবন পেতে যেমন চিকিৎসার প্রয়োজন, তেমনি মনুষ্য সত্তাকে পুরোপুরি শুচি সত্তার জ্ঞানালোকিত অবস্থানে নিয়ে যেতে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষা এমন একটি বস্তু যাকে জনে জনে বিভক্ত করার সামর্থ্য কারো নেই। আমার শিক্ষা আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেটা ইচ্ছা করলেও অন্য কারো মধ্যে ভাগ করা যাবে না। জীবনের এই মহাগুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার উৎপত্তিস্থল নিয়ে ভাবতে গেলে অনেক অসামঞ্জস্যপূর্ণ অব্যবস্থাপনা সামনে চলে আসে। একজন অপ্রকৃত অবুঝ মানুষকে পরিশুদ্ধ মানুষের কাতারে নিয়ে যেতে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার শুরুকালীন যে মহান দায়িত্ব পালন করে থাকে সেই প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক প্রেক্ষাপট কতটুকু সুস্থ, সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা রয়েছে।

যদি প্রশ্ন করা হয়, কীভাবে চলছে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা। উত্তরটা হবে, একেবারে নড়বড়ে। যেনতেনভাবে চলছে প্রাথমিক শিক্ষা। এই নড়বড়ে অবস্থার কারণ খুঁজতে গেলে প্রথমে সামনে চলে আসবে যোগ্যতাসম্পন্ন ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব। সরকার শিক্ষাকে বেশি গুরুত্ব দিলেও প্রাথমিক পর্যায়ের এ মাধ্যমটিতে উন্নতির লক্ষ্যমাত্রা তেমন সন্তোষজনক নয়। তবে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠদানে যথেষ্ট অসামঞ্জস্যতা থাকলেও বছরের প্রথমদিন কোটি কোটি নতুন বই শিক্ষার্থীদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বই উৎসব করা, উপবৃত্তি প্রদান, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন, প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেওয়াসহ সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে প্রাথমিকে সরকার অনেক বড় সফলতা দেখিয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে প্রশ্নটা হলো শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে। অযোগ্য ও অব্যবস্থাপনা প্রাথমিক শিক্ষার বিশুদ্ধ মানকে আটকে দিয়েছে। যদি শিক্ষার গোড়ায় গলদ থাকে তা হলে উচ্চশিক্ষার ভিত আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। তাই শিক্ষার হাতেখড়ি প্রাথমিক শিক্ষাকে আরও গুরুত্ব দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে গলদের কারণ খুঁজে বের করে তা নির্মূলের প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা সমাপ্ত হয়েছে মাত্র কয়েকদিন হলো। দেশের এই বৃহত্তম পরীক্ষায় ক্ষুদ্র কচি মনের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে এখন অবসর সময় পার করছে। তাদের সামনে কেবল ফল প্রাপ্তির প্রতীক্ষা। ফলাফল ঘোষণার পর প্রতীয়মান হবে কে কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে। সেই সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি-অবনতির দিকটাও বেরিয়ে আসবে। তবে সদ্যসমাপ্ত সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল যাই হোক, প্রাথমিক শিক্ষার চলমান গতিপ্রকৃতি যে সন্তোষজনক নয়, তা সময়ে সময়ে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত সংবাদবর্ণনায় পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। সংবাদবর্ণনায় জানা যায়, ২০১৫ সালের ইউনেস্কোর এশিয়া-প্যাসিফিক রিজিওনাল ব্যুরো ফর এডুকেশনের এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার মান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাবেই শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত হচ্ছে না। প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে বাংলাদেশ। প্রশিক্ষিত শিক্ষকের হার মাত্র ৫৮ শতাংশ। অথচ প্রতিবেশী দেশ নেপালে সরকারি প্রাথমিকে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের হার ৯০ শতাংশ, পাকিস্তান ও শ্রীলংকায় ৮২ শতাংশ করে, মালদ্বীপে ৭৮ শতাংশ এবং মিয়ানমারে শতভাগ শিক্ষকই প্রশিক্ষিত। এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক প্রশিক্ষণের হার শিক্ষানুপযোগী পর্যায়ে অবস্থান করছে।

প্রশিক্ষণসংক্রান্ত প্রশিক্ষিত শিক্ষকের কথা বাদ দিয়ে যদি বলি আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গন যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব কতটুকু বোধ করছে। সেখানেও বেশ বড় ঘাপলা বেরিয়ে আসবে। যোগ্যতার দিক থেকেও প্রাথমিকের অসংখ্য শিক্ষক অযোগ্য ও অদক্ষতার জালে আটকা পড়ে আছে। সংবাদভাষ্য মতে, দেশে এখন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার। এতে পড়ালেখা করছে প্রায় এক কোটি ৯৫ লাখ শিশু। তবে ২০১৩ সালে জাতীয়করণ করা প্রায় ২৬ হাজার বিদ্যালয়ের বেশিরভাগ শিক্ষকের মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কারণ এসব বিদ্যালয় বেসরকারি রেজিস্টার্ড থাকার সময় শিক্ষকদের নিয়োগ দিয়েছে বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ। তাদের বেশিরভাগই নিয়োগ পেয়েছেন ২০১১ সালের আগে। যখন নারীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার যোগ্যতার শর্ত ছিল মাধ্যমিক পাস আর পুরুষদের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক পাস। অভিযোগ রয়েছে, সে সময় পরিচালনা পর্ষদকে টাকা দিয়ে নিয়োগ পেয়েছেন অনেক শিক্ষক। তাদের বেশিরভাগেরই প্রশিক্ষণ নেই। প্রাথমিকের চার লাখ শিক্ষকের মধ্যে এই জাতীয়করণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা এক লাখের ওপর। এখন প্রশ্ন হলো, এই রেজিস্টার্ড স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষক যদি শিক্ষাদানে অপরিপক্ব হয় তা হলে প্রাথমিকের হাল অবস্থা কী হতে পারে। মেধাহীন শিক্ষক দ্বারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হলে শিক্ষার এই প্রাথমিক ক্ষেত্রটা আপনাআপনিই অধঃপতনের দিকে চলে যাবে।

প্রাথমিক শিক্ষা পিছিয়ে পড়ার আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে সৃজনশীল পদ্ধতি। এ পদ্ধতির আগাগোড়া বোঝেন এমন শিক্ষকের সংখ্যাও অতি অল্প। সরকার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সৃজনশীলতার নতুন ধারা যুক্ত করতে গিয়ে 'সৃজনশীল পদ্ধতি' সংক্রান্ত যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তা ইতিবাচক। তবে নতুন এই পদ্ধতিতে শিক্ষকরা পাঠদানে কতটুকু দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে কিনা সন্দেহ রয়েছে। কিংবা শিক্ষকের মাঝে সৃজনশীলতার প্রশিক্ষণচর্চা সঠিকভাবে পরিচালনা হচ্ছে বলেও মনে হয় না। শিক্ষাবিদরা বলেছেন, শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি নির্ভর করে শিক্ষকদের ওপর। এখন শিক্ষকদের মানই যদি প্রশ্নবিদ্ধ হয় তা হলে শিক্ষার মানও বাড়বে না। শিক্ষকদের দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ না থাকলে তারা শ্রেণিকক্ষের পাঠদানের মান নিশ্চিত করতে পারবেন না। সরকারের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তি প্রদান, বিনামূল্যের বই প্রদানসহ নানা পদক্ষেপের ফলে শতভাগ শিশুই বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। ঝরে পড়ার হারও ২০ শতাংশে নেমে এসেছে। অথচ দক্ষ শিক্ষকের অভাবে গুণগত মান নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। গত বছর প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনেও প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষকদের হতাশার চিত্র ফুটে উঠেছে। রিচার্স ফর অ্যাডভান্সমেন্ট অব কমপ্লিট এডুকেশনের (রেস) প্রকাশিত জরিপে বলা হয়, প্রাথমিকে ১৩ শতাংশ শিক্ষক পুরোপুরি সৃজনশীল বা যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন বোঝেন না। ৪২ শতাংশ সীমিত পরিসরে নিজেরা বুঝলেও ক্লাসে বোঝাতে পারেন না, বাকি ৪৫ শতাংশ বোঝেন। সৃজনশীল না বোঝায় ৪৭ শতাংশ শিক্ষক বাজারের গাইড বইয়ের ওপর নির্ভর করেন। ৩৫ শতাংশ সহকর্মীর সঙ্গে আলোচনা করেন এবং বাকি ১৮ শতাংশ নিজেদের ধ্যান-ধারণা থেকে পড়ান।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদবর্ণনা থেকে আরও জানা যায়, প্রাথমিকের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ বলতে গেলে জীবনে একবারই, সেই ফাউন্ডেশন ট্রেনিং। কিন্তু ওই প্রশিক্ষণ কতটুকু কাজে লাগছে তা সরকারের পক্ষ থেকে যাচাই করা হয় না। ২০১৫ সালের এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্টেও ধরা পড়েছে শিক্ষকদের যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণের ঘাটতি। তাতে বলা হয়েছে, ১৯৯৮ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারী শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ৪৮.৩ শতাংশ, ২০১৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৭.২ শতাংশে। তবে নতুন জাতীয়করণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই হার মাত্র ২৬.১ শতাংশ, উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে মাত্র ৮ শতাংশ এবং ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেশিরভাগ মাদ্রাসাতেই পড়ালেখা করেছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেশিরভাগ শিক্ষকই মানবিক বিভাগে পড়ালেখা করেছেন। ২০১৪ সাল পর্যন্ত মৌলিক প্রশিক্ষণ (সিইনএড, বিএড, এমএড) ছিল ৬৫.৯ শতাংশ শিক্ষকের। প্রশিক্ষণের গুরুতর ঘাটতি লক্ষ করা গেছে কিন্ডারগার্টেন ও ইবতেদায়ি মাদ্রাসায়। যাদের হার যথাক্রমে ১৫ ও ৭ শতাংশ। ২০১৪ সালে শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার ৮৯.৩ শতাংশ এবং যথাসময়ে উপস্থিতির হার ৬৬.১ শতাংশ। দেরিতে উপস্থিতির হার বেশি মাদ্রাসা ও নতুন জাতীয়করণ বিদ্যালয়ে। দেশে প্রতিদিন ১২ থেকে ১৩ শতাংশ শিক্ষক স্কুলে অনুপস্থিত থাকেন।

প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষক অনুপস্থিতির হারও উদ্বেগজনক। গ্রামাঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকার প্রাথমিক শিক্ষায় করুণ দশা লেগে আছে। দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটা বড় অংশ গ্রাম পর্যায়ে রয়েছে। এর মাঝে বেশ কিছু বিদ্যালয় রয়েছে একেবারে অজোপাড়াগাঁয়ে। সেখানে আনুষঙ্গিক অসুবিধার পাশাপাশি শিক্ষক হাজিরা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এক কথায় সর্বব্যথায় ব্যথিত প্রাথমিক শিক্ষার সুস্থধারা অব্যাহত রাখতে সুষ্ঠু পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। শিক্ষার শিকড়ে বিশুদ্ধ পানি ঢালার পাশাপাশি শিক্ষাতরু প্রাথমিক অঙ্গের সতেজতা ফিরিয়ে আনার জোর প্রচেষ্টা প্রয়োজন। সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে এ ব্যাপারে আরও যত্নশীল হতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষক অনুপস্থিতির হারও উদ্বেগজনক। গ্রামাঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকার প্রাথমিক শিক্ষায় করুণ দশা লেগে আছে। দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটা বড় অংশ গ্রাম পর্যায়ে রয়েছে। এর মাঝে বেশ কিছু বিদ্যালয় রয়েছে একেবারে অজোপাড়াগাঁয়ে। সেখানে আনুষঙ্গিক অসুবিধার পাশাপাশি শিক্ষক হাজিরা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এক কথায় সর্বব্যথায় ব্যথিত প্রাথমিক শিক্ষার সুস্থধারা অব্যাহত রাখতে সুষ্ঠু পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি

❑ বিশ্বজিত রায় : কলাম লেখক
bishwa85@gmail.com